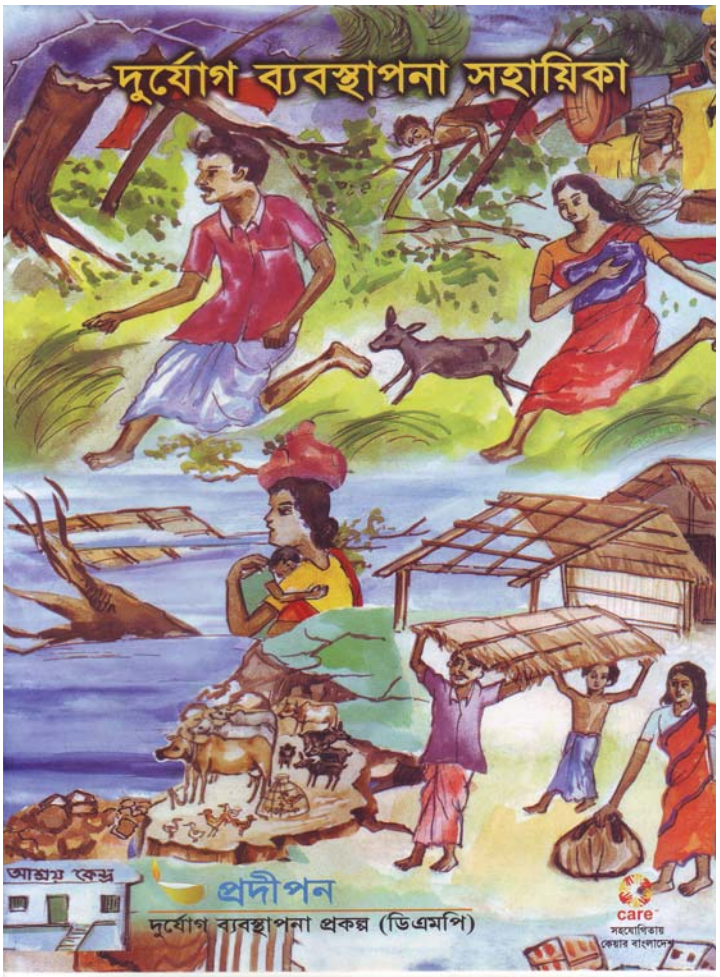

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা

সম্পাদনা উপদেষ্টা
ফেরদৌসউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, প্রদীপন

সম্পাদনা পরিষদ
সাজ্জাদুর রহমান এলিন
আমীর আখতার টয়
শাহীনুর রহমান

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
কেয়ার বরিশাল

প্রকাশকাল
মার্চ ২০০৪

অক্ষর বিন্যাস
শঙ্কর কুমার রায়

প্রচ্ছদ
ডিএমপি/আই,এফ,এস,পি-কেয়ার বাংলাদেশ/নিরাপদ-এর
'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০০৪' পোস্টার অবলম্বনে

প্রকাশনায়
প্রদীপন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএমপি)

প্রদীপন
সাহেববাড়ী রোড, মহেশ্বরপাশা
দৌলতপুর, খুলনা ৯২০৩।

মুখবন্ধ

প্রদীপন ১৯৮৪ সাল হতে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে স্থানীয়, বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত, সমস্যাবলী নিরসনে জনগণকে উদ্যোগী করে তোলার অভিপ্রায়ে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬টি বিভাগের ১৫টি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সংস্থার কর্মকান্ড বিস্তৃত। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সংগঠন বিনির্মাণের পাশাপাশি সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : সুন্দরবন সংরক্ষণের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, গৃহস্থলী আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও কম্পোস্ট উৎপাদন, হাসপাতাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়: নিষ্কাশন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমন, কর্মরত শিশু উন্নয়ন এবং আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বৃদ্ধি।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় ১,৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশের উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বড় বড় বেশ কয়েকটি নদী; রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে অবস্থান করছে বঙ্গোপসাগর। সঙ্গত কারণেই অধ্যুষিত জনসংখ্যার অধিকাংশকেই বাস করতে হয় উপকূল ও সংলগ্ন দুর্যোগ প্রবণ এলাকায়। প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগের কারণে অনেক প্রাণহানি হয়, বিনষ্ট হয় প্রচুর মূল্যবান সহায়-সম্পত্তির। তদুপরি, দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনো দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নয়; বিপদাপন্ন অনেক মানুষই জানেনা দুর্যোগের মুহূর্তে বা দুর্যোগ পরবর্তীতে তাদের করণীয় কি? দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন উদ্যোগ এবং সহায়তার জন্য।

অত্যন্ত আশার কথা হলো যে, সরকারী পর্যায়ে জাতীয়, জেলা, উপজেলা এবং এমনকি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। এসমস্ত কমিটি দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে বিপদ ও ঝুঁকি প্রশমনে সহায়তা করে।

স্থানীয় সরকারকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে উজ্জীবিত করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে প্রদীপন খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও অবহিতকরণের কাজ করছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কেয়ার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের মূল সহায়িকার সংক্ষিপ্তকারে এ সহায়িকাটি প্রদীপন মাঠ পর্যায়ে অনুসরণ করছে। আমরা আশা করি বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটির সাথে সংযুক্ত সকল সদস্য/সদস্যাদের দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সংরক্ষণের নিশ্চিতকরণে উদ্যোগী হতে এ সহায়িকাটি যথেষ্ট অবদান রাখবে।

এ সহায়িকার গুণগত মানবৃদ্ধিতে আপনাদের সকলের সু-পরামর্শ বিনীত প্রত্যাশা করছি।

প্রদীপন-এর দর্শন, উদ্দেশ্য ও কৌশল

দর্শন (Vision)

দরিদ্র মানুষের উন্নত জীবনধারণের উপযোগী স্থায়ীত্বশীল সমাজ গঠন

উদ্দেশ্য (Mission)

আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেন্ডার ও পরিবেশ চাহিদার সাথে বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে দরিদ্র মানুষের সংগঠন বিনির্মাণের সকল উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা।

কৌশল (Strategy)

১. গ্রামের ও শহরের দরিদ্র মানুষের সংগঠন বিনির্মাণে সহযোগিতা করা
২. অতি দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া
৩. প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
৪. দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে সমাজের গনমূখী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সহযোগিতা করা
৫. সংগঠিত ও প্রয়োজনে অসংগঠিত দরিদ্র মানুষদের জন্য আইনগত সহায়তার ব্যবস্থা করা
৬. প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা
৭. প্রদীপন এর অভ্যন্তরে ও উপকারভোগী দরিদ্র মানুষের মধ্যে জেন্ডার সাম্যের লক্ষ্যে কাজ করা
৮. প্রদীপন একটি শিক্ষা গ্রহণমূলক সংগঠন হিসাবে কাজ করবে
৯. প্রদীপন-এর উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে অগ্রাধিকার দেয়া
১০. সম্পদ আহরণের জন্য অন্যান্য সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা
১১. অভিজ্ঞতা বিনিময় ও দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সমমনা সংস্থার সাথে আন্ত:যোগাযোগ গড়ে তোলা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের লক্ষ্য

দুর্দশাগ্রস্ত/ঝুঁকিপূর্ণ জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বনের উপর থেকে দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসকরণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএমপি)-এর কার্যক্রম

স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

- স্থানীয় পর্যায়ের কর্ম পরিকল্পনার প্রণয়নে সহায়তা দান
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে কর্ম সম্পর্ক সৃষ্টি
- ইউনিয়ন পর্যায়ের জন প্রতিনিধিদের সাথে কর্ম সম্পর্ক সৃষ্টি
- স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সাথে কর্ম সম্পর্ক সৃষ্টি
- উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কর্ম তৎপরতা করা
- ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরীতে সহায়তা প্রদান
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সম্ভাব্য পরিকল্পনা (Local Level Action Plan) তৈরীতে সহযোগিতা প্রদান
- সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর আয়োজন করা এবং সহযোগিতা প্রদান করা
- স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণ এবং মহড়ার আয়োজন ও সহায়তা করা
- স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের দুর্যোগ মোকাবেলার (Copping Mechanism) উপায় সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সম্প্রচারকরণ।
- অংশীদারিত্বে যারা আছেন অর্থাৎ সহযোগী সংস্থা সমূহের সাফল্যের চলমান ঘটানো
- সম্পদ প্রদান
- কারিগরী সহযোগিতা প্রদান
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সম্ভাব্য পরিকল্পনা (উপজেলা,ইউনিয়ন) তৈরীকরণ বা তৈরীতে সহায়তা প্রদান
- যৌথভাবে সাড়া প্রদান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকার-এর কাঠামো

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, যার মূল কাজ হচ্ছে লোকাল লেভেল এ্যাকশন প্লান।

বিপদ এবং দুর্যোগ

বিপদ

এমন একটি ঘটনা যার দ্বারা জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

বিপদাপন্নতা

বিপদের মধ্যে থাকাকেই বিপদাপন্নতা বলে।

সক্ষমতা

কার্যকরী ভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতাকে সক্ষমতা বলে।

দুর্যোগের সংজ্ঞা (Definition of Disaster)

দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট এমন একটা ঘটনা যা হঠাৎ করে অথবা ধীরে ধীরে ঘটতে পারে। যার ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত জনগণগোষ্ঠীকে অবশ্যই ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হয়।

- ADPC

দুর্যোগ এমন এক চরম ঘটনা বা পরিস্থিতি যা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যা মোকাবেলা করতে ঐ আক্রান্ত সমাজের বাইরের সাহায্যের দরকার হয়।

- BDPC

দুর্যোগের প্রকার ভেদ

দুর্যোগ দু'ধরণের:

১. প্রাকৃতিক এবং ২. মানুষ সৃষ্ট।

	প্রাকৃতিক	মানুষ সৃষ্ট
ক	ঘূর্ণিঝড়	পরিবেশগত অবনতি
খ	বন্যা	স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠি, শরণার্থী
গ	জলোচ্ছ্বাস	যুদ্ধ/গৃহযুদ্ধ (আন্ত: জনগোষ্ঠি সংঘর্ষ)
ঘ	ভূমিকম্প (এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিকম্পজনিত জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বস ইত্যাদি)	শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিপর্যয়
ঙ	আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত	পারমাণবিক ও রাসায়নিক এবং গ্যাস সংক্রান্ত
চ	খরা (মানুষ সৃস্টও হতে পারে)	অনাবৃষ্টি ও খরা
ছ	অগ্নিকান্ড, উন্মুক্ত এলাকায় অথবা শহর এলাকায় (মানুষ সৃস্টও হতে পারে)	অগ্নিকান্ড
জ	টর্ণেডো	অপরিকল্পিত বাঁধ
ঝ	সুনামী	জনসংখ্যা বিস্ফোরণ
ঞ	মহামারী	দুর্ভিক্ষ/কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ
ট	ভূমিধ্বস	রাজনৈতিক অস্থিরতা

উভয় প্রকার দুর্যোগের পার্থক্য

প্রাকৃতিক	মানুষ সৃষ্ট
সাধারণত প্রতিহত করা যায় না, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে অনুমান করা যায়	প্রায়শই প্রতিহত করা যায়, এবং পূর্বাহ্নে অনুমান করা যায়

দুর্ঘটনা বিয়োগান্তক হতে পারে, কিন্তু কদাচিত এগুলো দুর্যোগ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

দুর্যোগ মোকাবেলায় পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়

- দুর্যোগ, দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানা।
- বাড়ীর ভিটায় মাটি সরে গিয়ে থাকলে অথবা নিচু হয়ে থাকলে নতুন মাটি তুলে ভরাট করা।
- বাড়ীর চারপাশে দুর্যোগে সহায়তাকারী গাছ লাগানো,সচেতন হওয়া,সংগঠিত হওয়া।
- আত্মীয় স্বজন,বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
- গ্রীষ্মকাল শুরুর প্রথমে ঘরবাড়ী মেরামত করা।
- নৌকাসহ অন্যান্য জলযান মেরামত করা।
- যে বাড়ীতে দুধের শিশু আছে সেখানে বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা করা।
- মৌসুমের শুরু থেকেই যতগুলো সম্ভব শুকনো নারকেল সংগ্রহ করে রাখা বিশেষ করে দুর্যোগের সময় ব্যবহারের জন্য।
- দা-খুন্তি-রশি যা ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই খুব দরকার হয় এমন সব জিনিস সংগ্রহে রাখা। প্রয়োজনে ঘূর্ণিঝড়ের আগে এগুলো মাটিতে পুতে রাখা বা সাথে নিয়ে যাওয়া।
- দুর্যোগ ঋতুতে কিছু জরুরী সামগ্রী যেমন-শুকনো খাবার,কাপড়, ঔষধ,ম্যাচ, কেরোসিন, জ্বালানী মোমবাতি ইত্যাদি সংগ্রহে রাখা।
- উল্লিখিত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের উৎস জানা।
- মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখির জন্য নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন কাউন্সিল ও কমিটির পরিচিতি

জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কাউন্সিল/কমিটি দায়িত্ব পালন করে।

ক) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
খ) আন্ত: মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি
গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল:

০১। প্রধান মন্ত্রী	...	সভাপতি
০২। মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণারয়	...	সদস্য
০৩। মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৪। মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৫। মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৬। মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৭। মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৮। মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
০৯। মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
১০। মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
১১। মন্ত্রী, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
১২। সেনা বাহিনী প্রধান	...	সদস্য
১৩। নৌ বাহিনী প্রধান	...	সদস্য
১৪। বিমান বাহিনী প্রধান	...	সদস্য
১৫। মন্ত্রী পরিষদ সচিব	...	সদস্য
১৬। প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য সচিব	...	সদস্য
১৭। সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
১৮। সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
১৯। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২০। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২১। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২২। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	...	সদস্য
২৩। সচিব, সড়ক ও রেল পথ বিভাগ	...	সদস্য
২৪। সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২৫। সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ	...	সদস্য
২৬। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২৭। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২৮। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	...	সদস্য
২৯। সদস্য, (আর্থ সামাজিক অবকাঠামো) পরিকল্পনা কমিশন	...	সদস্য
৩০। পি.এস.ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	...	সদস্য

কাউন্সিল বছরে অন্তত: দুইবার সভায় মিলিত হবে।

জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১। জেলা প্রশাসক	...	সভাপতি
২। জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ	...	সদস্য
৩। সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	...	সদস্য
৪। মহিলা প্রতিনিধি	...	সদস্য
৫। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি-প্রতিনিধি	...	সদস্য
৬। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর জেলা পর্যায়ে প্রতিনিধি (সিপিবি)	...	সদস্য
৭। এনজিও প্রতিনিধি	...	সদস্য
৮। জেলা, ত্রাণ ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা	...	সদস্য
৯। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি (দুর্যোগ কালীন সময়)	...	সদস্য

- জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যাগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন।
- স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ প্রেক্ষিতে সভাপতি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।
- এ কমিটি বৎসরে অন্তত: ৪ বার সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময়ে প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায় মিলিত হবে।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার	...	সভাপতি
২। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ	...	সদস্য
৩। উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ/বিভাগীয় প্রধান	...	সদস্য
৪। মহিলা প্রতিনিধি	...	সদস্য
৫। উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির প্রতিনিধি	...	সদস্য
৬। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর (সিপিবি) প্রতিনিধি	...	সদস্য
৭। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিনিধি	...	সদস্য
৮। এনজিওর প্রতিনিধি	...	সদস্য
৯। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	...	সদস্য সচিব

- স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/সদস্যাগণ এই কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন। স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজন বোধে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।
- এই কমিটি ২ মাস পর পর সভায় মিলিত হবেন। আপদকালীন সময়ে প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায় মিলিত হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	...	সভাপতি
২। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ	...	সদস্য
৩। শিক্ষক প্রতিনিধি	...	সদস্য
৪। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী কর্মচারী	...	সদস্য
৫। মহিলা প্রতিনিধি	...	সদস্য
৬। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর (সিপিবি) প্রতিনিধি	...	সদস্য
৭। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি	...	সদস্য
৮। এনজিও প্রতিনিধি	...	সদস্য
৯। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	...	সদস্য

- স্থানীয় পরিস্থিতি ও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।
- এই কমিটি প্রতি ২ মাস পর পর সভায় মিলিত হবে। আপদকালীন সময় প্রত্যহ একবার এবং অবস্থার কিছু উন্নতি হলে প্রতি সপ্তাহে ২ বার সভায় মিলিত হবে।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

স্বাভাবিক সময়ে:

১. ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে ঝুঁকি হ্রাসকরণে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের বিষয় সম্পর্কে যাতে স্থানীয় জনসাধারণ অবহিত হয় তা নিশ্চিতকরণ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং বেঁচে থাকার উপায়গুলির ব্যাপক প্রচার নিশ্চিতকরণ

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে অবহিত করে নিয়মিত দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

৩. নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আসন্ন বিপদ সংক্রান্ত সতর্কবার্তার প্রেক্ষিতে বা দুর্যোগ সংঘটিত হলে স্থানীয় জনসাধারণ,ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সংস্থাসমূহ যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৪. ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস অতিদ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জনসাধারনকে এ পর্যায়ে তাদের জানমাল রক্ষায় করনীয় সম্পর্কে অবহিত করন।

৫. প্রয়োজনীয় মুহুর্তে কোন এলাকার জনসাধারনকে কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় কেন্দ্রে/আশ্রয় হলে নিয়ে যাবেন, তা নির্ধারণ এবং আশ্রয়কেন্দ্রের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব প্রদান।

৬. উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্র/আশ্রয়স্থল সমূহের কাছে নির্ধারিত স্থান হতে পানি সরবরাহ এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সেবা প্রদানের বিষয় নিশ্চিতকরন:

৭. স্থানীয় উদ্ধারকার্য পরিকল্পনা, প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা,উপজেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ পুন: স্থাপন এবং মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে পূণর্বাসনের স্থানীয় ব্যবস্থা সম্বলিত আনুষাঙ্গিক পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৮. উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার,অপসারণ,উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণ কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাকরণ।

দুর্যোগকালে:

১. প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সুবিধাদি ব্যবহার করে প্রাথমিক উদ্ধারকার্য পরিচালনা এবং নির্দেশিত হলে, অন্যদেরকে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা প্রদান।

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে দুর্যোগের ক্ষতি সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও তা উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নীতিমালার অনুসরণে স্থানীয়ভাবে এবং অন্যকোন উৎস বা ত্রাণ ও পূণর্বাসন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পুনর্বাসন উপকরণাদি বিতরনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. প্রাপ্ত সম্পদ বিতরণের হিসাব উপজেলা কর্তৃপক্ষ বা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ।

এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষনিক আদেশ অনুসরণ করবে।

জন অংশগ্রহণ (Community Participation)

জন অংশগ্রহণ বলতে কি বোঝায় ?

জন অংশগ্রহণ বলতে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়া বুঝি যার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তা, দায়িত্ব, সমস্যা ও সম্পদ সম্পর্কে সচেতন ও উৎসাহিত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জন অংশগ্রহণের গুরুত্ব:

- স্থানীয় জনগণ নিজেরা নিজেদের বিপদ,বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।
- জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা সমাধান ও বিপদাপন্নতা কমাতে পারবেন।
- বিপদ ও বিপদাপন্নতার অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।
- দুর্যোগ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজস্বতা অনুভব করবে, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে এবং ক্ষমতাবান হবেন।
- জীব ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারবেন।
- উন্নয়ন কর্মসূচীকে সুদূর প্রসারী ও টেকসই করতে সক্ষম হবেন।

সামাজিক মানচিত্র (Social Mapping)

সামাজিক মানচিত্র হলো কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার অবস্থা ও অবস্থানের প্রতিকী প্রতিফলন। একটি সামাজিক মানচিত্রে সাধারনত: ঘর বাড়ীর অবস্থান,সম্পদ,সমস্যা, সেবা প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো (রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট-বাজার) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতি

অতীতের দুর্যোগের ঘটনায় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অনুরূপ একটি ঘটনাকে অনুমান করে পূর্ব থেকে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যথাযথ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো দুর্যোগ প্রস্তুতি।

অথবা

একটি দুর্যোগের ঘটনাকে অনুমান করে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব থেকে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই দুর্যোগ প্রস্তুতি।

দুর্যোগ প্রস্তুতির গুরুত্ব সমূহ

- যে কোন দুর্যোগে দ্রুত এবং সংগঠিত উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণকে নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে।
- জনগণের দুর্ভোগ,জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে।
- সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করে।
- মানবসম্পদ, অর্থসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকরী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগের সময় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কাছে পৌছাতে সহায়তা করে।
- দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (লজিষ্টিক) নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগের সময় ত্রাণ কার্য পরিচালনা পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে।
- সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি কার্যকরী 'তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।
- কার্যকরী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করে।

কার্যকর দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় সমূহ:

- বিপদ ও বিপদাপন্ন নিরুপন ও বিশ্লেষণ
- পরিকল্পনা প্রণয়ন
- প্রতিষ্ঠান তৈরী
- প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন
- ভবিষ্যৎবাণী/সতর্কতা প্রচার করা
- জনসাধারণ এবং জন সমাজকে সচেতন করা
- সহজলভ্য সম্পদের তালিকা এবং কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা
- কাঁচামাল মজুদ/সরবরাহের জন্য গুদামজাত করা
- যোগাযোগ এবং তথ্য ব্যবস্থা
- কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন
- অর্থ যোগান।

বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate)

বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত: চার ভাগে ভাগ করা যায়:

ঋতু	কাল/সময়	আবহাওয়া জনিত ঘটনা	বৃষ্টিপাত
গ্রীষ্মকাল (বর্ষার পূর্ব সময়)	মার্চ-মে	কাল বৈশাখী, টর্ণেডো, শিলা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়	৩৭০ মি:মি: ১৭%
বর্ষাকাল	জুন-সেপ্টেম্বর	প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, মৌসুমী নিম্নচাপ, বন্যা	১৬২৫ মি:মি: ৭২.৫%
শরৎকাল (বর্ষা উত্তর সময়)	অক্টোবর-নভেম্বর	ঘূর্ণিঝড়, টর্ণেডো	২০৮ মি:মি: ০৯%
শীতকাল	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী	অস্বাভাবিক শুস্কতা,শীত	৩৩ মি:মি: ১.৫%

ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত সমূহ

[সামুদ্রিক বন্দরের জন্য সংকেত সমূহ]

সংকেত	সংকেতের অর্থ	করণীয় সমূহ
১নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেত ২নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারী সংকেত ৩নং স্থানীয় সতর্ক সংকেত	সমুদ্রের কোন একটি অঞ্চলে ঝড়ো হাওয়া বইছে এবং সেখানে ঝড় সৃষ্টি হতে পারে। সমুদ্রে একটি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। বন্দর দমকা হাওয়ার সম্মুখীন	• এমন কোথাও যাবেন না যেখান থেকে আসতে ১ দিনের বেশী সময় লাগে। • মূল্যবান ও ভাসমান জিনিসপত্র কোথায় কি অবস্থায় আছে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। • গাবাদী পশুপাখি বাড়ীর কাছাকাছি রাখা। • প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছাকাছি রাখা। • রেডিও ও টিভিতে প্রচারিত আবহাওয়া বার্তা শুনুন।
৪নং স্থানীয় হুঁশিয়ারী সংকেত ৫নং বিপদ সংকেত ৬নং বিপদ সংকেত ৭নং বিপদ সংকেত	বন্দর ঝড়ের সম্মুখীন, তবে বিপদের আশংকা এমন নয় যে চরম নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। অল্প বা মাঝারী ধরনের ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে। এবং ঝড়টি বন্দরে দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। (মোংলা বন্দরের বেলায় পূর্ব দিক দিয়ে) অল্প বা মাঝারী ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। (মোংলা বন্দরের পশ্চিম দিক দিয়ে) অল্প বা মাঝারী ধরনের ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করবে।	• মূল্যবান সামগ্রী ঘরের মেঝে বা শক্ত মাটির নিচে পুতে ফেলা। • শুকনো খাবার বা পানি পাত্রে ভরে গর্ত করে মাটির নিচে রাখা। • শিশু,বৃদ্ধ,গর্ভবতী মা ও পশুদের আগেভাগে আশ্রয় কেন্দ্রে বা নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। • গবাদী পশুদের উঁচু নিরাপদ স্থানে বা কিল্লায় নিয়ে যাওয়া বা বাধন খুলে দেওয়া। • অপসারন নির্দেশ পেলে কোথায় কোন কোন নিরাপদ স্থানে যাবেন তা ঠিক করে ফেলা। • নিজের সাথে সাথে অপরকেও স্থানান্তরে সাহায্য করা। • ঘন ঘন আবহাওয়া বার্তা শুনতে থাকুন।
৮নং মহা বিপদ সংকেত ৯নং মহা বিপদ সংকেত ১০নং মহা বিপদ সংকেত	প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকবে এবং ঘূর্ণিঝড়টি বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করা আশংকা রয়েছে। (মোংলা বন্দরের বেলায় পূর্ব দিক দিয়ে) প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগ পূর্ণ থাকবে এবং ঘূর্ণি ঝড়টি বন্দরের উত্তর দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। (মোংলা বন্দরের বেলায় পশ্চিম দিক দিয়ে) প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে বন্দরের আবহাওয়া দুর্যোগ পূর্ণ থাকবে এবং ঘূর্ণি ঝড়টি বন্দরের নিকট অথবা উপর দিয়ে উপকূল অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে।	• এই সংকেতের প্রধান করনীয় কাজ হচ্ছে জীবন বাঁচানো। • সম্পদ/মালামালের ক্ষতির দিকে নজর না দিয়ে জীবন বাচানো। • অপসারণ (বাড়ী ত্যাগের নির্দেশ) নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আশ্রয় কেন্দ্র বা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়া। • প্রয়োজনে জোর করে/বল প্রয়োগ করে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা। • স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশাবলী মেনে চলুন।
১১ নং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংকেত	ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন	

কত ঘন্টা আগে কোন সংকেত দেখানো হয়

৬ সতর্ক সংকেত - ২৪ ঘন্টা আগে এক পতাকা

৬ বিপদ সংকেত - ১৮ ঘন্টা আগে দুই পতাকা

৬ মহা বিপদ সংকেত - ১০ ঘন্টা আগে তিন পতাকা

নদী বন্দরের জন্য সংকেত

নদীবন্দর সমূহের জন্য ৪ (চার) প্রকার সতর্কীকরণ সংকেত প্রচার করা হয়। এই সংকেতগুলোর অর্থ ও পরিচিতি নিম্নরূপ:

১নং নৌ সতর্ক সংকেত
কোন এলাকায় বিক্ষিপ্ত কালবৈশাখী বা সামুদ্রিক ঝড়ের আশংকা আছে। কিন্তু এর জন্য নৌ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে না।

২নং নৌ হুঁশিয়ারী সংকেত:
ঘন্টায় অনধিক ৬১ কি:মি: গতিসম্পন্ন সামুদ্রিক ঝড় বা কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া আঘাত হানতে পারে। যে সকল নৌযানের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট বা তার কম সেগুলোকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

৩নং নৌ বিপদ সংকেত:
সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৮৬ কি:মি: বেগে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। সমস্ত জলযানকে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

৪নং নৌ মহা বিপদ সংকেত:
ঘন্টায় ১১৮ কি: মি: বা তদুর্ধ প্রচন্ড সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। সমস্ত জলযান নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে।

বন্যা (FLOOD)

কোন এলাকায় হঠাৎ করে অথবা ধীরে ধীরে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে যে প্লাবনের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্লাবন যদি ক্ষয়ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায় তবে তাই বন্যা।

বন্যা কি ?

- পানির উচ্চতা বৃদ্ধি = বন্যা ?
- প্লাবণ = বন্যা ?
- ক্ষয়ক্ষতি = বন্যা ?

বন্যা = প্লাবন+ক্ষয়ক্ষতি

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে:

স্থান+গভীরতা+স্থায়িত্ব+সময়+ব্যাপকতা

বন্যার কারণসমূহ:

- উজানের দেশসমূহ থেকে আসা প্রচুর পানি
- দেশের প্রধান তিনটি নদী অববাহিকায় একসাথে পানি বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাতের সংমিশ্রণ।
- স্বল্প সময়ে অধিক পানির চাপ।
- উজানের দেশ সমূহে হাজার হাজার মাইল ডাইক নির্মাণের ফলে দ্রুত পানি বাংলাদেশে চলে আসা।
- নদী,খাল,জলাশয়ের তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া।
- নদী পথের গতি পরিবর্তন হওয়া।
- নদী খালের পাড় ভরাট হয়ে/করে ক্রমাগত পানির নির্গমন পথ সরু হয়ে যাওয়া।
- পানি প্রবাহে/নিষ্কাশনে বাধা।
- যথোপযুক্ত বাঁধের অভাব।
- অপরিকল্পিত বাঁধ/রাস্তা ঘাট নির্মাণের ফলে।
- সমতল ভূ-খন্ড।
- উজানের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া।
- নদীর বাঁধ বা জলাধার ভেঙ্গে যাওয়া।
- অপরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন কাঠামো/ব্যবস্থা।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও দ্রুত নগরায়নের ফলে।
- শহরের আশেপাশে প্রাকৃতিক হ্রদ,নিম্নাঞ্চল,জলাশয় ভরাটের ফলে।
- সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের ফলে।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে।
- বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে।
- বিশেষজ্ঞদের ভাষায়: নদীকে বিরক্ত করোনা,তাহলে নদীও তোমাকে বিরক্ত করবে না। নদীর সাথে সহবস্থানই শ্রেয়।

অবস্থান ভেদে বন্যা চার প্রকার:

১. আকস্মিক বন্যা (Flush Flood)	এপ্রিল- মে
২. মৌসুমী বন্যা (Monsoon Flood)	জুলাই- সেপ্টেম্বর
৩. অতিবৃষ্টিজনিত (স্থানীয়) বন্যা (Congestion Local Drainage)	জুলাই- সেপ্টেম্বর
৪. জোয়ার জনিত বন্যা (Tidal Flood)	এপ্রিল- অক্টোবর

বাংলাদেশে বন্যাসৃষ্টির কারণসমূহ:

বন্যার কারণসমূহ দুটি ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত:

১. প্রাকৃতিক

২. মানব সৃষ্ট

১. প্রাকৃতিক

ক) বাংলাদেশ হিমালয়ে উৎপন্ন নদী অববাহিকার ব-দ্বীপ বলে এখানে বন্যার প্রার্দুভাব বেশী। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে প্রধান নদ-নদী দিয়ে প্রচুর পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হয়। প্রধান নদ-নদী থেকে গড়িয়ে পানি নীচু এলাকায় জমে দেশের নিম্নাঞ্চলে জলাশয়ের সৃষ্টি করে রেখেছে। দেশের ৬৫% জমিই গড় সমুদ্র পৃষ্ঠের ৭.৫ মিটার উচ্চতার নচিে। মোট আয়তন ১৪৪০০০ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ২৫০০০ বর্গকিলোমিটার হাওর ও বিল, যা সামান্য বৃষ্টিতে তলিয়ে ফসল ও মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করে।

খ) ছোট বড় ২৩০টি নদী জালের মতো বিস্তারিত হয়ে দেশটিকে বিশাল ব-দ্বীপে পরিণত করেছে। এ নদীগুলো সমগ্র দেশকে ৪টি অববাহিকায় বিভক্ত করেছে। যেমন- : (ক) ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (খ) গঙ্গা অববাহিকা (গ) মেঘনা অববাহিকা ও (ঘ) দক্ষিণ পূর্ব পাহাড়ী অববাহিকা। এসকল নদীর বুকে গড়ে উঠে অসংখ্য বালুচর, যাহা পানির প্রবাহকে বাধা করে ও উপচিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে প্রতি বছর একত্রে এগুলো প্রায় ২.৪০ বিলিয়ন টন পলি মাটি বহন করে। এই পলিমাটির ৫.৭% হারে নদীর তলদেশে থেকে যায়। হিসাবে দেখা গেছে বার্ষিক সব নদীর পলি যোগ করলে দাড়ায় আনুমানিক ৫৫২ রক্ষ ঘনমিটার। বাংলাদেশে ড্রেজার রয়েছে ৩৬টি যা দিয়ে ড্রেজিং করা যায় মাত্র ৮৭ লক্ষ ঘনমিটার, যা চাহিদার ১৫% মাত্র। বার্ষিক ড্রেজিং দরকার অন্তত: ৫১৮ লক্ষ ঘনমিটার। তাই গত ২০ বছর নদীগুলোতে প্রায় ২০ ফুট উঁচু পলি মাটির স্তর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে খাল বিল উপনদীগুলো ভটার হয়ে যাচ্ছে।

গ) উপরোক্ত কারণে প্রতি বছর সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বাড়ছে। হিসাবে দেখা গেছে যথাক্রমে কক্সবাজার, মেঘনার মোহনা চরচঙ্গায় ও সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে যথাক্রমে ৭.৮, ৬ ও ৮ মিলিমিটার হারে। এদেশের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রের গড় উচ্চতা থেকে উপকূলে ৩ মিটার সর্ব উত্তরে পঞ্চগড়ে ৬০ মিটার। উপকূল এবং নদী তীরবর্তী একটা এলাকা ভরা-জোয়ারে (পূর্ণিমা-অমাবশ্যায়) এমনিতেই প্লাবিত হয়। আবার বর্ষাকালে জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে নদী থেকে সমুদ্রে পানি নামতে সময় লাগে, অন্যদিকে উজান থেকে বেশী করে পানি আসা শুরু হলে

পানি নামতে বিলম্বিত হয় ও বন্যা সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের নদী দিয়ে যে পরিমাণ পানি প্রবাহিত হয় তার ৯২% পানি আসে উজান দেশ সমূহ থেকে। বাকী ৮% আভ্যন্তরীণ বৃষ্টির পানি থেকে। এক হিসাবে দেখা গেছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে দেশের আয়তনের ১৪ গুন বেশী এলাকার অর্থাৎ ২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকার পানি নিষ্কাশিত হয়। প্রবল মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে সমুদ্যের পানি গড়ে প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার বেড়ে যায়, এতেও নদীর পানি নির্গমন ব্যবস্থা বাধা প্রাপ্ত হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

ঘ) অধিক হারে ভূমিকম্পের ফলে হিমালয়ে বরফ রাশি ভেঙ্গে নদীতে আসছে, ভূমি ধ্বস হয়ে প্রচুর পরিমাণ পলি নদীতে আসছে, অতএব, নদীতে পানির উচ্চতা ও তলদেশে পলির স্তর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তাতে নদীগুলো দুকূল উপচিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

ঙ) ভূতাত্বিক কারণে দেশের উত্তর পশ্চিম (রাজশাহী,পাবনা,বগুড়া) উত্তর পূর্ব (সিলেট ও ময়মনসিংহের হাওর এলাকা) এবং দক্ষিণে (খুলনা ফরিদপুরের বিল এলাকা) বর্ষা শুরুর সাথে সাথে বন্যা হয় এবং নভেম্বর পর্যন্ত পানি আটকে থাকে।

চ) সাম্প্রতিক কালে এলনিনোর প্রভাবকেও বন্যার কারন বলা হচ্ছে।

২. মানব সৃষ্ট

ক) দেশে মানুষ বাড়ছে। জ্বালানী ও আসবাবপত্রের চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ কেটে ফেলছে বন জঙ্গল। গাছ পালা নিদনের ফলে বৃষ্টির পানি সরাসরি মাটিতে পড়ে ভূমিক্ষয় হয় এবং নদীর পানি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করে। গাছ পালা বেশী থাকলে বৃষ্টির পানি ধীরে ধীরে মাটিতে পড়ে, মাটি কিছু পানি শোধন করে নিতে পারে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তা ও বসতবাটি তৈরী করে পনি চলাচলের স্বাভাবিক পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচুর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে জমি খন্ডিত হয়ে পানির স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছে।

শিল্পায়নের এ যুগে মানুষ যে পরিমান কার্বনডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরী করে বায়ুমন্ডলে ছাড়ছে, তা শোধন করে নোর মত পর্যাপ্ত বনভূমি বাড়ছে না বৈ কমছে। তাতে ওজন স্তরে প্রতিক্রিয়াসহ ভারসাম্যহীন জলবায়ু বিভিন্ন দুর্যোগের বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি করছে।

খ) গত কয়েক বছরে উজান দেশ সমূহে বহু বাঁধ তৈরী হয়েছে, এর ফলে উপরে আটকে পড়া পানি হঠাৎ এসে বন্যার সৃষ্টি করে।

সাধারণত দুই উপায়ে বন্যা ব্যবস্থাপনা করা যায়

১. কাঠামোগত (Structure) ব্যবস্থা

২. অ-কাঠামোগত (Non-structure) ব্যবস্থা

কাঠামোগত

(Inundation Prevent/প্লাবন রোধ করা)

- জলাধার নির্মাণ
- ডাইক,লেভী,ড্যাম নির্মাণ
- নদী/খাল পুন: খনন
- পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ
- পর্যাপ্ত স্লুইচ গেট নির্মাণ
- বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো ও বনায়ন তৈরী করা
- বহুবিধ ব্যবহারযোগ্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ
- ফ্লাড লেভেলের উপর পরিকল্পিত রাস্তা ঘাট,বাড়ী-ঘর এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ
- ড্রেনেজ চ্যানেল নির্মাণ
- বিপদাপন্ন এলাকায় জনপদ গড়তে না দেয়া
- পাঁকা স্কুল/কলেজ,অফিস বা পাঁকা বাড়ী ঘর নির্মাণ (যেগুলো প্রয়োজনের সময় সেল্টার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।)
- প্রকল্প গ্রহণের আগে দুর্যোগকে মাথায় রেখে প্রকল্প প্রণয়ন।

কার্যকরী বন্যা মোকাবেলায় আগাম কর্মকান্ডসমূহ

- দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা করে রাখা
- জ্বালানী সংগ্রহ/চুলা তৈরী
- সেল্টার চিহ্নিত করন
- সেল্টার পর্যায়ে টয়লেটের ব্যবস্থা
- খাদ্য ও অর্থ মজুদ
- শস্য ও শস্যের বীজ সংরক্ষণ
- বাঁধ/লেভী/ডাইক/রাস্তা মেরামত
- পাড়ায় পাড়ায় কমিটি করে দায়িত্ব দিয়ে রাখা
- জরুরী ত্রাণ/খাবারের যোগান চিহ্নিত করে রাখা
- খাবার পানির ব্যবস্থা/ঔষধের উৎস জেনে রাখা
- পশু-পাখি সংরক্ষণ
- উদ্ধার পরিকলপনা/নৌকার ব্যবস্থা রাখা
- স্থানীয় সরকারী/বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখা
- সাঁতার শেখা (সম্ভব হলে)
- বন্যা শেষে শস্য রোপন
- সচেতনতা ও সতর্কীকরণ।

ভূমিকম্প

ভূ-অভ্যন্তরে হঠাৎ সৃষ্ট কোন কম্পন যখন ভূ-ত্বককে আন্দোলিত করে সাধারণত তাকেই ভূমিকম্প বলে। অন্যভাবে বলা যায় ভূ-অভ্যন্তরের দ্রুত বিপুল শক্তি বিমুক্ত হওয়ায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে ঝাকুনী বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাই ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের সময় ও পরে করণীয়

ভূমিকম্প খুব অল্প সময়ের জন্যই ঘটে থাকে। তাই এ সময় দিশেহারা না হয়ে নিচের বিষয়গুলো মেনে চলতে চেষ্টা করবেন।

- শান্ত থাকুন। এটাই সে সময় সবচেয়ে বেশী জরুরী
- দ্রুত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সুইচ বন্ধ করুন এবং বাড়িতে জ্বলতে থাকা আগুন নিভিয়ে ফেলুন।
- যত দ্রুত সম্ভব ঘর থেকে বাইরে বেরুতে হবে।
- খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।
- এ সময় লিফটে উঠবেন না।
- ঘরের ভিতরে থাকলে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- রাস্তায় থাকলে উঁচু বাড়ী,বড় গাছ থেকে দূরে সরে যান।
- উপরতলায় থাকলে কম্পন বা ঝাকুনী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- এ সময় দ্রুত হেলমেট মাথায় দিন এবং অন্যদেরকেও পরতে দিন।
- উপরতলায় থাকলে আতঙ্কে নিচে লাফ দেবেন না এবং জানালার পাশে থাকবেন না।
- পানিতে থাকলে ঝটপট পাড়ে উঠে আসতে হবে।
- কলাম দেয়া পাঁকা ঘরে কলামের গোড়ায় আশ্রয় নিতে হবে।
- ইটের গাঁথুনি বা পাঁকা ঘর হলে ঘরের এক কোনে আশ্রয় নিতে হবে।
- ষ্টীলের আলমারী,শোকেজ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- এ সময় কোনো কিছু বাঁচানো বা মূল্যবান জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য দেরী করবেন না।

যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগই হঠাৎ করে আসে। আর এই দুর্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তাই এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সচেতন থাকা এবং বাড়ী ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরীর সময় নিয়ম মেনে চলা। বাড়ী তৈরীর সময় খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করলে তা আপনার বাড়িটিকে দুর্বল করবে। বলা যায় না, এই ফাঁকি হয়তো আপনার জীবনের বিনিময়েই শুধতে হবে। তাই সতর্ক থাকুন।

আর্সেনিক

আর্সেনিক কি?

আর্সেনিক একটি বিষাক্ত রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ। ভূ-গর্ভস্থ মাটিতে আর্সেনিক প্রাকৃতিকভাবেই থাকে। অন্য কোন মৌলিক পদার্থের (যেমন- অক্সিজেন, ক্লোরিন, সালফার, কার্বন ও হাইড্রোজেন) সাহায্য ছাড়া এটি সরাসরি পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে না। বিশেষ করে অক্সিজেনের সাথে এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়। অন্যদিকে সীসা, পারদ, সোনা ও লোহার সঙ্গে যৌগরূপে আর্সেনিকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এ ধাতব মৌলিক পদার্থটি থেকে রসুনের গন্ধ পাওয়া যায় এবং এটি বাতাসে পোড়ালেও রসুনের গন্ধ বের হয় কিন্তু পানিতে মিশে গেলে এর আর কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। তবে আর্সেনিক ও অক্সিজেনের যৌগ (আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড) ঘন সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়।

আর্সেনিক সাধারণত দুই প্রকার:

ক) জৈব আর্সেনিক: মনোমিথাইল আর্সেনিক এসিড, ক্যাকোডাইলিক এসিড, সালফার সিনামাইন, স্টভারসল ইত্যাদি।

খ) অজৈব আর্সেনিক: আর্সেনাস অক্সাইড, সোডিয়াম আর্সেনাইট ও আসাইন গ্যাস ইত্যাদি। তবে জৈব আর্সেনিকের তুলনায় অজৈব আর্সেনিক অধিকতর বিষাক্ত।

বাতাস, মাটি ও পানি সহ পরিবেশের উপাদানগুলিতে প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক থাকে।

- দূষণমুক্ত মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ কেজি প্রতি ৫৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত থাকতে পারে।
- বায়ুতে সাধারণত প্রতি ঘনমিটারে ০.০৪ থেকে ৩০ ন্যানোগ্রাম আর্সেনিক থাকতে পারে।
- প্রাকৃতিক জলাধারে প্রতিলিটার পানিতে ১-২ মাইক্রোগ্রাম পানি তাকে।
- বেশীর ভাগ ফলমূল, মাছ, মাংশ ও সব্জিতে সামান্য পরিমাণে আর্সেনিক থাকে। তবে সামুদ্রিক পানি ও মাছে বেশী পরিমাণে আর্সেনিক থাকে।
- সামুদ্রিক মাছের প্রতি কেজিতে ৫ মিলিগ্রাম আর্সেনিক থাকে।

খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে মানুষ যে আর্সেনিক গ্রহণ করে তা জৈব আর্সেনিক, যার বিষাক্ততা তুলনামূলকভাবে কম। একজন সুস্থ্য মানুষ দৈনিক প্রতি কেজি ওজনের বিপরীতে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক গ্রহণ করতে পারে। তবে স্পর্শকাতর মানুষ দৈনিক কেজি প্রতি ২০ মাইক্রোগ্রামেই অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আর্সেনিক মারাত্মক বিষ হলেও কৃষি ও শিল্পখাতে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। চর্মরোগ, আমাশয়, হাঁপানী, কুষ্ঠ, সিফলিস, যক্ষা ও লিউকেমিা রোগের ঔষধ তৈরীতে আর্সেনিকের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আর্সেনিকের ব্যবহার রয়েছে। কীটনাশক, গ্লাস, গ্লাসওয়ার, বিভিন্ন শিল্প, ক্যামিক্যাল, তামা ও সীসার শংকর ধাতু তৈরীতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও টেক্সটাইল, কাগজ ও পশুর চামড়া সংরক্ষণে আর্সেনিকের ব্যবহার রয়েছে।

খাবার পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী পানিতে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হলো প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম। বাংলাদেশে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ধরা হয়েছে প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম। বিভিন্ন দেশে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা বিভিন্ন।

আর্সেনিক সমস্যার কারণ

বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করলেও অনেকে মনে করেন আর্সেনিক দূষণের মূল কারণ হলো অধিক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ্য পানির উত্তোলন। প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক আকরিক হিসাবে অন্যান্য পদার্থের সাথে যুক্ত থাকে এবং অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পানিতে মিশে যায়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হচ্ছে যে টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভের পানিবাহী স্তরে প্রচুর পরিমাণ বাতাস বছরের পর বছর ধরে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। পানিবাহী স্তরের উপরিতলকে বলা হয় ওয়াটার টেবিল। ভূগর্ভ থেকে পানি পেতে হলে ওয়াটার টেবিল পর্যন্ত নলকূপের পৌঁছাতে হয়। ওয়াটার টেবিল থেকে ভূপৃষ্ট পর্যন্ত এ অঞ্চলকে বলা হয় বায়ুসক্রিয় অঞ্চল বা এ্যারোটেড জোন। এ অঞ্চলের মাটির দানা ও ফাঁক গুলো বায়ুতে পূর্ণ থাকে এবং বাতাসের অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। টিউবওয়েল চাপের মাধ্যমে ওয়াটার টেবিলে ঢুকিয়ে দেয়া বাতাস ও এ্যারোটেড জোনের বাতাসের সংস্পর্শে এসে আর্সেনিক জারিত হয়। এর ফলে আর্সেনিক বেরিয়ে এসে পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে। এ পানি পান করলে আর্সেনিক বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এও মত দেন যে, শিল্প কারখানার বর্জ্যের মধ্যে আর্সেনিক আছে, বর্জ্য হিসাবে এগুলো নদীতে ফেলা হলে নদীর পানিতে আর্সেনিক মিশে গিয়ে সংক্রমন ঘটাতে পারে। নদীর পানি দিয়ে প্রতি বছর কোটি কোটি টন পলি মাটি বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে যায়, এই পলিমাটির সঙ্গেও আর্সেনিক এসে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের কোন কোন বিশেষজ্ঞ পল্লী বিদ্যুতের ৬ লক্ষ খুঁটিতে আর্সেনিকের ব্যবহারও আর্সেনিক দূষণের কারণ বলে মনে করেন। তবে, পানিতে আর্সেনিক দূষণের কোন স্বত :সিদ্ধ কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনও একমতে আসতে পারেননি।

আর্সেনিকের প্রতিক্রিয়া

আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ। এই বিষের মারণমাত্রা হলো ১২৫ মিলিগ্রাম, পারদের তুলনায় এই বিষ চারগুন শক্তিশালী। আর্সেনিকের প্রতিক্রিয়া হলো বমি, রক্ত বমি, পেটের যন্ত্রণা, জন্ডিস, কিডনীর ক্ষমতা লোপ পাওয়া, মাথার যন্ত্রণা, হাতে-পায়ে কালো কালো দাগ, কুষ্ঠের মতো ঘা এবং দীর্ঘকাল ভোগার পর ক্যান্সার। আর্সেনিক দূষণ প্রতিক্রিয়ায় রোগীর নখ, চুল পরীক্ষা করলেই এই বিষের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কারণ এই বিষের বড় অংশ চুলে ও নখে এসে জমা হয়। আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

ক) তীব্র বিষক্রিয়া: এর মারণমাত্রা ধরা হয়েছে সর্বনিম্ন ১৩০ মিলিগ্রাম যা গ্রহণের ১২-৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়।আর্সেনিক গ্রহণের আধঘন্টা পরেই রোগীর তীব্র বিষক্রিয়ায় বমি বমি ভাব হয়, গলা ও পাকস্থলীতে অসস্তব

জ্বালাপোড়া হয়, হাত-পায়ের মাংশপেশীতে খিচুনী ধরে এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাছাড়া কালো ও রক্তমিশ্রিত পায়খানা শুরু হয়, পরে তা বর্ণহীন গন্ধহীন হয়ে পানির মত বের হতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

খ) মাঝারী বিষক্রিয়া: প্রাথমিক উপসর্গ হলো বদহজম, বমি, গলায় শির শির ভাব, তলপেটে ব্যাথাসহ পায়খানার বেগ। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে থাকে, স্নায়ু প্রদাহ শুরু হয় ও মাংশপেশীতে খিচুনী শুরু হয়। রোগীরা বিষন্নতায় ভোগে এবং ক্রমান্বয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। রোগীরা অস্থির হয়ে পড়ে, ঘুম আসে না; ফলত: মৃত্যুবরণ করে।

গ) ধীর বিষক্রিয়া: সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশী আর্সেনিক দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে এই বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ত্বক, স্নায়ুতন্ত্র, যকৃত, হৃদপিন্ড ও শ্বাসতন্ত্র সহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এর প্রকাশ শুরু হয়।

আর্সেনিক বিষক্রিয়ার স্তর

আর্সেনিক দূষিত পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। উপসর্গ গুলো শরীরে প্রকাশ পেতে ৮ থেকে ১০ বছর সময় লেগে যায়। ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে লক্ষণ প্রকাশে সময়ের তারতম্য ঘটতে পারে। কত দ্রুত লক্ষণগুলো প্রকাশ পাবে তা নির্ভর পানির মাধ্যমে গৃহীত আর্সেনিকের পরিমাণ, ব্যক্তির খাদ্যগ্রহণের পুষ্টিমান, তার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দূষিত পানি পান করার সময়কালের উপর। সাধারণত আর্সেনিকের বিষক্রিয়া মানব শরীরে আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। বিষক্রিয়ার মাত্রা ধীরে ধীরে তিন স্তরে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এ তিনটি স্তর হলো যথাক্রমে-

১. **মেলানোসিস :** আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের স্বাভাবিক রং বদলে ক্রমশ কালো হয়ে যায়। প্রথমে হাত ও পায়ে এবং পরে সমগ্র শরীরে পরিবর্তন দেখা যায়।

২. **কেরাটোসিস :** হাত ও পায়ের তালু শক্ত হয়ে ক্রমশ শক্ত হয়ে যায়। রোগীর শরীরে আঁচিলের মতো গোটাও দেখা যায়। এ অবস্থায় ব্যাথা বা চুলকানী অনুভূত না হলে ক্রমশ তালুতে ঘা দেখা দেয়।

৩. **চূড়ান্ত রূপ :** হাত পায়ের পচনসহ ক্যান্সার দেখা দেয়। এ ছাড়াও শারীরিক দুর্বলতা, অরুচি, রোদে চোখ মুখ জ্বালা পোড়া করা, বেশী গরম অনুভব, দীর্ঘ মেয়াদী কাশি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা

আর্সেনিক কোন বংশগত বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। দূষণ মুক্ত পানি পান বন্ধ করলে এ বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তবে এর সাথে পুষ্টিকর ও ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া অত্যন্ত জরুরী।

আর্সেনিক সমস্যা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

যত দূর জানা যায় ১৯৮৫ সাল থেকে সরকার আর্সেনিক সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিল। নিপসম ১৯৯৪ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দার তীরে বারোখরিয়া ইউনিয়নে আর্সেনিক রোগীর সন্ধান লাভ করে এবং বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যার কথা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে সরকার এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, বৈজ্ঞানিক কমিটি এবং আর্সেনিক টেকনিক্যাল কমিটি নামে তিনটি কমিটি গঠন করে।

সর্বশেষ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এতো বেশী লোক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত বিশ্বের কোথাও এমন নজীর এখনও দেখা যায়নি। বাংলাদেশের ৪৫ ভাগ অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হয়। এক সমীক্ষায় সকল সরকারী-বেসরকারী সংস্থার হিসাবে প্রায় ৩০ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষা করা হয় যাতে আর্সেনিক সনাক্তকৃত নলকূপের হার ১৯.৪%। দেশের ৬০টি জেলার ৩৬৮টি থানায় নলকূপের পানি পরীক্ষা করে ৪৪টি জেলার ১৫৫টি থানায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

নিম্নে ক্ষতিগ্রহতার মাত্রা অনুযায়ী জেলার অবস্থান তুলে ধরা হলো।

অধিক দূষণযুক্ত জেলা	কম দূষণযুক্ত জেলা	দূষণ মুক্ত জেলা
নবাবগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, মরীয়তপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালি, ফেনী, চাঁদপুর,কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, খুলনা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বরিশাল ও পিরোজপুর।	গাইবন্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জামালপুর, নেত্রকোনা, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও চট্টগ্রাম।	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি ও গাজীপুর

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ নিরসনে সমস্যাসমূহ

ক) থানা ও জেলা পর্যায়ের চিকিৎসকদের এ রোগের ধারণা খুবই সামান্য
খ) সেচ কার্যে অপরিকল্পিত পানি ব্যবহার
গ) সরকারী পর্যায়ে অপ্রতুল বাজেট
ঘ) আর্সেনিক পরীক্ষায় পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি থানা পর্যায়ে নেই
ঙ) গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারী পরীক্ষার সুযোগও কম।

আর্সেনিক বিষক্রিয়াজনিত কারণে সামাজিক সমস্যা সমূহ

আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা নিচে দেয়া হলো:

- অনেকে এই চর্মরোগকে কুষ্ঠ রোগ মনে করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একঘরে করে ফেলে।
- হাতের তালুতে ক্ষত হলে মানুষের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
- প্রতিবেশীরা রোগীকে নলকূপ ব্যবহার করতে দেয় না।
- অবিবাহিত মেয়েদের বাইরে আসতে দেয়া হয় না এবং তাদের বিবাহ দেয়া মুশকিল।
- আক্রান্ত ছেলে মেয়েদের স্কুলের সহপাঠিরা এড়িয়ে চলে।
- স্বামী-স্ত্রী দুজনের একজনের হলে উভয়ের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।
- সর্বোপরি উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার জন্য বিশেষ জরুরী

- লাল দাগ দেয়া নলকূপের পানির আর্সেনিক দূষিত, এর পানি পান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- কূয়া বা ইঁদারার পানি নিরাপদ, প্রয়োজনে ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- সঠিক উপায়ে সংগৃহীত বৃষ্টির পানি নিরাপদ।
- সংরক্ষিত পুকুর থেকে সংগ্রহের পর ফিল্টার অথবা ফুটানো পানি নিরাপদ।
- আর্সেনিক দূষিত পানিকে ফুটিয়ে নিরাপদ করা যায় না।
- জীবানুমুক্ত ও আর্সেনিক মুক্ত পানিই নিরাপদ, এ পানির উৎস খুঁজে বের করতে হবে।
- দীর্ঘদিন আর্সেনিক দূষিত পানি ব্যবহার করলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়, পরে এই দূষিত পানি পান করা বন্ধ করে দিলে রোগের বিষক্রিয়ার কিছুটা উপশম হয়।
- আর্সেনিক আক্রান্ত লোকজনের খাওয়ার পানির উৎস চিহ্নিত করতে হবে।
- জনসাধারণকে নলকূপের পানি পরীক্ষা করানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতি ৬ মাস অন্তর নিরীক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।
- জনগণকে আতঙ্কিত না করে সচেতন করতে হবে। বলতে হবে এটা কোন ছোঁয়াচে বা বংশগত রোগ নয়। কেবলমাত্র আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলেই এই রোগ হয়। এই পানি পান ছেড়ে দিলে রোগের উপশম হয়।

আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির উৎসসমূহ ও প্রক্রিয়া

বিভিন্ন উৎস থেকে আর্সেনিক মুক্ত পানি পাওয়া সম্ভব। নিম্নে কয়েকটি উৎসের ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হলো:

ক) কূয়া বা ইঁদারা

কূয়ার জল নিরাপদ। এখনও এতে আর্সেনিক পাওয়া যায়নি। একটি ছোট্ট ইঁদারা থেকে ২০ জনের পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব। মাটিতে গর্ত করে ২-২.৫ ফুট পোড়ামাটির গোলচাক একটির উপর আরেকটি বসিয়ে কূয়া তৈরী করা যায়। গভীরতা ৩০ থেকে ৩৬ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। চৈত্র বৈশাখ মাসে পানির স্তর নীচে নেমে গেলে কূয়া বসাতে হয়। কূয়া সাধারণত খোলা জায়গায় থাকে বলে এর পানি সহজে যাতে দূষিত না হতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

খ) বৃষ্টি থেকে সংগৃহীত পানীয় জল (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং)

বৃষ্টির পানীয় জলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। টিনের বা টালির তৈরী ঘরের চাল এবং পাকা দালানের ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা হয়। পানি সংগ্রহের জন্য চাল বা ছাদের চারপাশে টিনের ট্রেয়া কিংবা প্লাষ্টিক পাইপ ব্যবহার করা হয়। গ্রামাঞ্চলে খড়ের ব্যবহার এখনও ব্যাপক। খড়ের চাল থেকে সংগৃহীত বৃষ্টির পানি নিরাপদ নয়। তবে, খড়ের চালের উপর পলিথিন বিছিয়ে দিয়ে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করলে সে পানি নিরাপদ হবে।

বাংলাদেশে গড়ে বৃষ্টিপাত অনুযায়ী বৃষ্টির উৎস হতে যে পরিমাণ পানি সংগ্রহ করা যায় তাতে একটি পরিবারের সারা বছরের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব। বৃষ্টির পানি সংগ্রহে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরণের পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন মাটির তৈরী পাত্র, ষ্টীলের ট্যাংক, ফেরোসিমেন্টের তৈরী পাত্র এবং প্লাষ্টিকের তৈরী পাত্র। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক বিবেচনা করে পাত্রগুলির ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করা যায়।

এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত পানি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সংগ্রহ করার পদ্ধতি সঠিক না হলে দীর্ঘ দিন পানি সংগ্রহে রাখার ফলে কিছু ব্যাকটেরিয়া বা পোকার জন্ম হতে পারে। এজন্য সতর্কতা হিসাবে এই পদ্ধতির সাথে কলস বা চারকল ফিল্টার বা ছোট বালুর ফিল্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ) বালির ফিল্টার দিয়ে পুকুরের পানি শোধন (পি.এস.এফ পদ্ধতি)

যেসব এলাকায় মাটির নীচ থেকে পানি তোলা সম্ভব নয় বা পান করার উপযোগী নয় সেসব এলাকায় এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত পুকুর বা লেকের পানি বালুর তৈরী ফিল্টারের মাধ্যমে পানের উপযোগী করা হয়। পুকুর বা লেকের পানি সহজে দূষিত হতে পারে, যার কারণে পানি বাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। তার জন্য সংরক্ষিত পুকুর হিসাবে দূষণ মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পি.এস.এফ পদ্ধতির ব্যবহার

সংরক্ষিত পুকুরের পার্শ্বে ইটের গাঁথুনী দিয়ে একটি চৌবাচ্চা তৈরী করা হয় যার মধ্যে তিনটি অসমান প্রকোষ্ট থাকে। চৌবাচ্চার উপরে বাইরের দিকে একটি টিউবওয়েল বসানো হয় এবং টিউবওয়েলের সাথে পাইপ লাগিয়ে তা মাটির নীচ দিয়ে পুকুরের পানির সাথে সংযুক্ত করা হয়। চৌবাচ্চার উপরের প্রকোষ্ঠে ইটের সুড়কি এবং শুকনা নারিকেলের ছোবড়া রাখা হয়। টিউবওয়েলে চাপ দিলে পুকুর থেকে পানি পাইপের মাধ্যমে এই প্রকোষ্ঠে আসে এবং এখান থেকে পানির ময়লা পরিষ্কার হওয়ার পর ফিল্টার প্রকোষ্ঠে যায়। ফিল্টার প্রকোষ্ঠে বালু, খোয়া এবং প্লাষ্টিকের ফিল্টার বা ইটের টানেল দিয়ে পানি ফিল্টার হয়ে সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠে যায়। সংরক্ষণ প্রকোষ্ঠের সাথে কল লাগানো থাকে যা দিয়ে ব্যবহারকারীরা পানি সংগ্রহ করে। চৌবাচ্চাটি উপরের দিকে একটি ঢাকনী দ্বারা সবসময় ঢেকে রাখা হয়।

ঘ) কলস ফিল্টার পদ্ধতি

কলস ফিল্টার পদ্ধতিটি বাংলাদেশে এখনও বহুল প্রচলিত। টিউবওয়েলের পানিতে অতিরিক্ত আয়রণ থাকলে এই পদ্ধতিতে আয়রণ মুক্ত করা হয়, তবে তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। স্থানীয় ভাবে সহজলভ্য উপাদান দিয়ে এ ফিল্টার তৈরী করা হয়। মাটির কলস, বালু, খোয়া এবং বাড়ীতে ব্যবহৃত জ্বালানী

কাঠের কয়লা ফিল্টার তৈরীর প্রধান উপাদান। কলস হতে ফোটায় ফোটায় পানি বের হওয়ার জন্য নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে সলতে তৈরী করতে হয় যেটা সহজে পচনশীল নয়। কলসগুলো একটার উপর একটা বসানোর জন্য বাঁশ বা কাঠের ষ্ট্যান্ড তৈরী করতে হয়। সবার উপরের কলসীতে অপরিশোধিত পানি দিতে হয়, সেখান থেকে পানি ছিদ্রের সলতে দিয়ে ফোটায় ফোটায় পরবর্তী খোয়াযুক্ত কলসীতে আসে, সেখান থেকে আবার ফোটায় ফোটায় বালিযুক্ত কলসীতে আসে, এবার ঐ কলসীর ছিদ্র সলতে দিয়ে ফোটায় ফোটায় কাঠ কয়লার কলসীতে আসে, এখান থেকে পানি পরিশোধিত হয়ে ছিদ্রের সলতে দিয়ে সর্বনিম্ন কলসীতে জমা হয়।

কূয়া বা ইদারার পানি দিয়ে কলস ফিল্টার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটাতে খরচ অত্যন্ত কম - সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে। দুই মাস পর ফিল্টার মাধ্যমগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ২৪ ঘন্টা ফিল্টার প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে হয় এবং এর মাধ্যমে ৪-৫ সদস্যের পরিবারের খাওয়ার পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব।

ঙ) ছোট বালির ফিল্টার

এ ফিল্টার বানানো খুবই সহজ। পানির উৎস হিসাবে কূয়া বা ইদারার ২০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্লাষ্টিকের ড্রাম, বালু, সুড়কী, প্লাষ্টিকের ফিল্টার যা টিউবওয়েলে ব্যবহৃত হয়, একটি ট্যাপ ও এক টুকরা সিনথেটিক কাপড় দিয়ে এ ফিল্টার বানানো যায়। প্লাষ্টিকের ড্রামের নীচের অংশে ট্যাপের সাথে যুক্ত করে প্লাষ্টিকের ফিল্টার বসানো হয়। ড্রামের সর্বনিম্ন অংশে খোয়া রাখা হয়, যেখানে প্লাষ্টিক ফিল্টার যুক্ত থাকে। তাপ উপরের অংশে বালি রাখা হয়, বালির উপরের অংশে সিনথেটিক কাপড় রাখা হয়, সিনথেটিক কাপড়ের উপরের অংশে অপরিশোধিত পানি রাখা হয়। প্লাষ্টিকের ড্রামটি ঢাকনা দিয়ে সবসময় ঢেকে রাখতে হয়।

এ ফিল্টার তৈরী করতে সর্বোচ্চ ১৫০০ টাকা খরচ হয়, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বার্ষিক ২০০ টাকার মধ্যে। এ ফিল্টার ২৪ ঘন্টাই চালু রাখতে হয় এবং এ পদ্ধতিতে দৈনিক ১২০ জন মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়।

চ) ডেলএ্যাগুয়া

এটি সহজে বহনযোগ্য যন্ত্র যা দিয়ে পানির জীবানুঘটিত দূষণ বিশ্লেষণ করা হয়। জরুরী অবস্থায় দীর্ঘদিন ব্যবহারের জন্য গবেষণাগার ছাড়া মাঠ পর্যায়ে পানির গুণাগুণ যাচাইয়ের জন্য এটি নির্ভরযোগ্য। এ যন্ত্রের সাহায্যে পানির নমুনা বিশ্লেষণ করে শুধু জীবাণু আছে কি না জানা যাবে, তবে জীবাণু থাকলে সেটি কোন রোগের জীবাণু তা বোঝা যাবে না।

অধিকার

অধিকার স্বার্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত, বস্তুত অধিকার বলতে নৈতিক বা আইনগত বিধি-বিধানের দ্বারা সংরক্ষিত স্বার্থকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অধিকার স্বার্থ বিশেষ।

অন্যভাবেও অধিকারকে ব্যাখ্যা করা যায় -

অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধার দাবীকে বুঝায়, যে দাবী হয় নৈতিক না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে।

অধিকারকে ব্যাপক অর্থে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়:

১। **নৈতিক অধিকার** (Moral Right): যে অধিকারের ভিত্তি নৈতিকতা (Rule of natual justice) এবং যা ভঙ্গ করলে নৈতিক অপরাধ হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলে। যেমন- সন্তানের নিকট হতে শ্রদ্ধালাভের নৈতিক অধিকার মাতা পিতার রয়েছে।

২। **আইনগত অধিকার** (Legal Right): যে অধিকার দেশের আইন (Positive Law) দ্বারা স্বীকৃত এবং যা আইনগত ভিত্তিতে দাবী করা যায় এবং যা ভঙ্গ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে।

মানবাধিকার

মানবাধিকার বলতে মানুষের যে কোন অধিকারকে বোঝায় না, মানবাধিকার শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনগত ও নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে সেগুলোই মানবাধিকার যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ 'শুধু মানুষ হিসেবে' দাবী করতে পারে।

মানবাধিকারের প্রধান দুটো বৈশিষ্ট্য হলো:

১। সার্বজনীন সহজাততা (Universal inherence) এবং
২। অহস্তান্তরযোগ্যতা (Inalienability)

মৌলিক অধিকার

যখন কতিপয় মানবাধিকারকে কোন দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Consitutional guarantees) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয় তখন তাদেরকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার কিন্তু সব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়।

মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য

মানবাধিকার	মৌলিক অধিকার
মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ব্যাপক	মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ
মানবাধিকার উৎস হলো আন্তর্জাতিক আইন	মৌলিক অধিকারের উৎস হলো দেশের সংবিধান
মানবাধিকার কোন ভৌগলিক সীমা রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়	মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ
মানবাধিকার বলবৎ করা যায় না কারন তা দেশের সংবিধান স্বীকৃত নয়	মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করা আইন দ্বারা সেগুলো স্বীকৃত
সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়	সকল মৌলিক অধিকই মানবা

জেন্ডার (Gender)

জেন্ডার বলতে বুঝায় :

সামাজিকভাবে গড়ে উঠা নারী পুরুষের পরিচয় বা সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য বা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী-পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন।

দুর্যোগে নারীদের বেশী ঝুঁকির কারণ সমূহ

- শিশুদেরসহ নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া
- অন্ত:স্বত্তা
- সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
- সচেতনতার অভাব
- পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা
- সিদ্ধান্তহীনতা
- পরিবার ও সংসারের জিনিসপত্রের উপর বিশেষ আকর্ষন
- অদৃষ্টবাদিতা

দুর্যোগে নারীদের সক্ষমতা সমূহ

- প্রবল মানসিক প্রস্তুতি বা শক্তি
- পরিবারের জিনিসপত্র রক্ষায় অধিক সামর্থ/আগ্রহী
- সমুদ্রের মত গভীর ধৈর্য্যশীলতা ও সহনশীলতা
- ভাল স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা পালন
- সেবা, রান্না করা, শিশুর যত্ন, খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য মহিলাদের সংগঠিত করা
- খাদ্য মজুদে স্থানীয় জ্ঞান, জ্বালানী সংগ্রহ ,হারিয়ে যাওয়া পশুপাখি উদ্ধার।

দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনা

দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনা হলো সেই উপায় বা উপায়সমূহ যা দ্রুত ও কার্যকরীভাবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার, অন্যান্য সংস্থা,কমিউনিটি বা ব্যক্তি পর্যায়কে সক্ষম করে তোলে। অন্য কথায় ভবিষ্যতের কোন অনিশ্চিত অবস্থাকে সুষ্ঠ ও কার্যকর ভাবে মোকবেলা করায় সহায়তা করাই দুর্যোগ পরিকল্পনা।

দুর্যোগ কর্ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- সম্ভাব্য কোন দূর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি কাঠামো দাঁড় করানো। দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সকল কার্যক্রম দক্ষভাবে পরিচালনা করা।
- সংস্থার সকল স্তরের কর্মীদের মানসিক শৃঙ্খলা ও প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা

একটি কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা
নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে পারে:

- একটি স্বচ্ছ ও সুসংঘবদ্ধ ধারণা দান করে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের সকলের জন্য একটি সাধারণ নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে।
- সমন্বয় মূলক কর্মকান্ডের একটি ভিত্তি তৈরী করে।
- দায় দায়িত্বের স্বচ্ছ বন্টন নিশ্চিত করে।
- দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয়ে ধারণা প্রদান করে।
- বর্তমান ও ভবিষ্যত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

এই বন্যার দেশ
এই ভাঙনের মাটি
হোক দুর্যোগমুক্ত.....

আসুন, আমরা আরো একটু সচেতন হই।
সচেতন করি আমাদের প্রতিবেশী, সহকর্মী আর
আমাদের স্বজনদেরকে।

সবাই মিলে মোকাবেলা করি সর্বনাশা দুর্যোগকে!

প্রদীপন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ডিএমপি)